জর্জিয়ায়, সাভানার পথে

অরুণাভ সেনগুপ্ত

সবুজ অ্যাপালাচিয়ান গিরিমালার পায়ের কাছে ইতিহাসের ঝাঁপি নিয়ে বসে আছে আমেরিকার এই দখিনা রাজ্যটি।

কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই ফুলে উঠল আটলান্টার শহরতলি দিয়ে বয়ে যাওয়া চ্যাটাহুচি নদী। স্রোতে এখন পাহাড়ি নদীর দুর্বারতা। অ্যাপালাচিয়ানের উপর থেকে আসা মেঘেদের দেখে নদীর হয়তো মনে পড়েছে তার জন্ম চেরুকি ইন্ডিয়ানদের প্রিয় সা-কা-নেক বা নীল কুয়াশায় ঘেরা ব্লু রিজ মাউন্টেনের প্রান্তদেশে। সেই নীল পাহাড়, তার ওক পাইনের ছায়াঢাকা পদপ্রান্ত, আর চ্যাটাহুচির কোল ছেড়ে চেরুকি আর ক্রিক ইন্ডিয়ানরা অবশ্য দুশো বছর আগেই সাদা আমেরিকানদের বসতি বিস্তারের খাতিরে বহু অশ্রুসিক্ত পথ (ট্রেলস অফ টিয়ার) বেয়ে সুদূর ওকলাহামায় বিড়াল পার হয়ে গেছে। ত্রয়োদশ ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে ১৭৩৩-এ জন্ম নেওয়া জর্জিয়ার বর্তমান রাজধানী আজকের আটলান্টায়, প্রায়-অদৃশ্য সেই 'রেড ইন্ডিয়ান' ধরিত্রীপুত্রদের উপস্থিতি হয়তো কিছুটা দৃশ্যমান কৃষ্ণাঙ্গ বা অন্য ভিন্নজাতীয় অবয়বের মিশেলে, ভগ্নাংশের হিসাবে। কাম্বারল্যান্ডের রেস্তোরাঁয় দেখা হাস্যমুখী বাদামিগাত্র পরিবেশনকারিণীটির কোঁচকানো চুল আর পুরু ঠোঁটের উৎস সম্ভবত লাগাতার যুদ্ধে পুরুষসদস্যের সংখ্যায় ভাটা পড়া কিছু রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ঘরজামাই করার প্রথা। অথবা এটাও ঘটনা যে, কালো ক্রীতদাস রাখা কিছু 'সভ্য' লাল উপজাতি ওকলাহামায় নির্বাসন যাত্রার সময় কালো সাথীদের আপন করে নিয়েছিল। তবে, আজকের আটলান্টায় ওই ভ্রান্ত শনাক্ত 'লাল ভারতীয়'র চাইতে আসল ভারতীয়দের উপস্থিতি অনেক বেশি সোচ্চার। বাজারে কাছারিতে তো বটেই, উৎসবে উপাসনাতেও। ত্রিশ একর জমির ওপর স্বামী নারায়ণ মন্দির তার মর্মরসাজে দিলওয়াড়া-তিরুপতির উত্তরাধিকার নিয়ে আটলান্টার এক বড় আকর্ষণ।

সাভানায় রিভার স্ট্রিট ধরে চলেছে স্ট্রিটকার

স্টোন মাউন্টেন-এ লেসার শো-র প্রতীক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা

দুশো বছর আগে ভূমিপুত্রদের তাড়িয়ে উত্তর জর্জিয়ার শ্বেতাঙ্গদের বসতি বিস্তার, রেললাইন পাতা শুরু, আটলান্টা নগরের পত্তন। ক্রিক ইন্ডিয়ানদের পায়ে চলা পথ পিচট্রি ট্রেল ধরে তৈরি হল বসতি, দোকানপাট। 'গন উইথ দি উইন্ড' উপন্যাসের চরিত্র— স্কারলেট ও'হারা, রেট বাটলারদের সে পৃথিবী বাতাসে মিলিয়ে গেলেও, লেখিকা মার্গারেট মিচেলের বর্ণনায় বিখ্যাত হয়ে যাওয়া পিচট্রি রোড আজও আটলান্টার প্রধান রাস্তা। সে রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে মনে পড়ল এ রাস্তাই একদিন প্রাণ নিয়েছিল মিচেলের। অচিরেই এক প্রধান যোগাযোগ হাব হয়ে ওঠা আটলান্টা আজ পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমানবন্দর। ছুটির দিনে ভিড় বেশি দেখি শহরের মাঝে অলিম্পিক সেন্টিনিয়াল পার্কে, অলস গ্রীষ্মের দুপুরে উৎসারিত ফোয়ারায় জলকেলিতে ব্যস্ত বাচ্চাদের ঘিরে মা-বাবারা এলিয়ে বসে, মাঝের চওড়া পথ জুড়ে চলছে সাদা পোশাকে গোলাপি ফিতে আঁটা পতুয়া স্বেচ্ছাসেবীদের ফেস্টুন পতাকা নিয়ে ক্যানসার-বিরোধী কুচকাওয়াজ। ভ্রমণার্থীদের ভিড় বেশি একপাশে সিএনএন সদর দফতরে, অন্যপাশে প্রায় টালা ট্যাঙ্কসম জলধারণ ক্ষমতার বিখ্যাত জর্জিয়া অ্যাকোয়ারিয়ামে, সেখানে বাড়তি পাওনা হুল্লোড়বাজ ডলফিনদের দুরন্ত এক মঞ্চাভিনয়। আর ভিড় 'কোকাকোলার দুনিয়া'য়, যেখানে শোনা যাবে ১৮৬১-র গৃহযুদ্ধে আহত জন পেমবার্টনের নিজের জন্য তৈরি এক বেদনাহর মিশ্রণের বিশ্বখ্যাত পানীয় হয়ে ওঠার গল্প, অবশ্যই মার্কিনি ঢং-এ পরিক্রমা ও বহুমাত্রিক তথ্যচিত্রসহ। বহুমাত্রিক, কারণ ত্রিমাত্রিক ছবির গতির সঙ্গে দর্শকাসনও সেখানে আন্দোলিত হয়। গায়ে লাগে দৃশ্যানুযায়ী ঠান্ডা বাতাস বা জলের ছিটা। সপ্তম মাত্রা বোধহয় ওদের নানা পানীয়ের যথেচ্ছ আস্বাদন, স্থানীয় রুচি অনুযায়ী যাদের হরেক দেশে হরেক রূপ।

মিউজিয়াম-মেট্রো-মল নিয়ে আটলান্টা আর পাঁচটা মার্কিন শহরের মতোই, তবে নিউ ইয়র্কীয় উচ্চকিত ভাবটুকু নেই বা লাস ভেগাসীয় উদ্দামতা। সাবেক মার্কিন পাড়াগুলোতে সন্ধে আটটা বাজতেই দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে পড়ে পাড়া। নব্যবসতির টাউন হাউস বা পাঁচিল-ঘেরা ভাড়াটে বাড়ির বিশাল সব দঙ্গল জমির ঢালে গাছের আড়ালে অদৃশ্য। একটা গিরিবর্ত্মের উপর ছড়ানো বলে নগরনির্মাণ প্রকৃতিকে গ্রাস করেনি, পায়ের নাগালেই ট্রেকিং, বাইকিং ট্রেল, নৌকা ভাসানোর জল।

মার্কিনরা বেশি উৎসাহী অন্য এক বৃত্তান্ত বর্ণনে, যা কিছু কেজো মানুষের নতুন জাতি গড়ার, রাজরাজড়ার রূপকথা-বিহীন এক কাহিনি। ভাবুক আমেরিকানদের মতে যে-জাতির জন্ম আমেরিকায় প্রথম ইংরেজ বসতি জেমসটাউনে ১৬২০ সালে কুড়িজন জাহাজডুবি আফ্রিকানের আগমনে, তিন মহাদেশীয়দের মিলনে। সে কাহিনিতে উত্তর আমেরিকায় ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের গল্প বলে ফ্লোরিডার সেন্ট অগাস্টিন, ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামস বার্গ বা জেমস টাউন। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বলে বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, ইয়র্কটাউন, আর আটলান্টায় আছে দাসপ্রথার সমর্থক দক্ষিণি রাজ্যগুলির কনফেডারেশনের সঙ্গে উত্তরের ফেডারেল বাহিনীর গৃহযুদ্ধের ইতিহাস। আটলান্টা হিষ্ট্রি সেন্টার আর গ্রান্ট পার্কের অতিকায় ঘূর্ণায়মান পট প্রদর্শনী (পুনর্নির্মাণের পর ফের হিষ্ট্রি সেন্টারেই স্থানান্তরিত) ছাড়াও ইতিউতি ছড়ানো নানা স্মারকস্তম্ভ আর স্মৃতিসৌধে এক স্মৃতিমেদুর নগরের স্বাক্ষর। কনফেডারেট দক্ষিণ জর্জিয়া আক্রমণ করতে এসে উত্তর জর্জিয়ার তরঙ্গায়িত প্রান্তর আর নবীন আটলান্টার উদ্যম পেরিয়ে, উত্তরের ফেডারাল বাহিনীর সেনানায়ক উইলিয়াম শেরম্যানের দৃষ্টি গিয়েছিল একদম দক্ষিণে সাগরকূলে সাদা বেলাভূমি আর পামগাছের সারির মধ্যে স্থিতধী অভিজাত বিত্তশালী সাভানার দিকে। দক্ষিণি গরিমার

দৈর্ঘ্য ছোট। সিডিতে পুরনো গান বাজছে, মনটা অতীতগামী হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর-দক্ষিণের বিরোধ বাড়তেই থাকল। 'আঙ্কল টম'স কেবিন' পড়ে অনেকেরই হৃদয় উদ্বেলিত। লিঙ্কন ডাক দিলেন 'বন্ধন মুক্তি'র। কাণ্ড ঘটালেন খ্যাপাটে অ্যাবলিশনিস্ট জন ব্রাউন। ক'জন দাস-মালিককে খুন করে চড়াও হলেন হারপারস বেরির অস্ত্রাগারে। উদ্দেশ্য লুঠ করা অস্ত্র বিলিয়ে দেবেন নিগ্রোদের মধ্যে। সে গল্প বলার জন্য হারপারস বেরি ১৮৫৯ সালের মতোই সেজে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেখানে ব্লু রিজ মাউন্টেন ফুঁড়ে পোটোম্যাক নদী এসে পড়ছে শেনানডহ নদীতে। সবজেটে জলের উপর দুই পাহাড়ের রোদ-ছায়ার মধ্যে বিছিয়ে রয়েছে এক রেলসেতু। মনে পড়বে জন ডেনভারের গান, 'কান্ট্রি রোড, টেক মি হোম'। ধরা পড়ে জন ব্রাউন ফাঁসি গেলেন, আর জন্ম দিয়ে গেলেন এক পল্লবিত গল্পগাথা আর গণসঙ্গীতের, 'জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিস্থলে, তার আত্মা বহিমান'।

১৮৬০-এ লিংকন রাষ্ট্রপতি হতেই দক্ষিণি রাজ্যগুলি একে একে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে নিজেদের কনফেডারেশন গড়ে তুলল। লিংকন ডাক দিলেন উত্তরের রাজ্যগুলি থেকে ৭৫ হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিকের জন্য। দক্ষিণে, মিচেলের বর্ণনায়, দক্ষ ঘোড়সওয়ার বা বন্দুকবাজ ছোকরারা 'ক্লেটন ওয়াইল্ড ক্যাটস' বা 'রাফ এন্ড টাফ' ইত্যাদি দল বানিয়ে মহড়া শুরু করল। মেয়েমহলে যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক পুরুষরা প্রণয়ের অনুপযুক্ত। সর্বত্র একটা রোমান্টিক উত্তেজনা, গা গরম-করা ভাব। কেউ ভাবেইনি যে রেল-টেলিগ্রাফ-রাইফেল-মাইন প্রথমবার ব্যবহার করা এই যুদ্ধ চলবে প্রায় পাঁচ বছর, মারা যাবে সাড়ে ছ'লাখ সেনা। প্রথম যে-দিন ফেডারেল সৈন্য ব্লু কোটসরা কনফেডারেট বাহিনী গ্রে কোটসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল, পিছনে চলল ব্রুহাম, ফিটল, বাগিতে চড়ুইভাতির মেজাজে সপরিবারে ওয়াশিংটনবাসীদের মিছিল। কিন্তু তিন বছর পরও যুদ্ধের তীব্রতা কমল না। লিংকন রাজনৈতিক পাঁকে। একটা হেস্তনেস্ত চাই। তাঁর নির্দেশে শেরম্যান জর্জিয়া আক্রমণ করলেন। পার্বত্য পথে ঘাঁটি আগলে দাঁড়ালেন জনস্টন। কিছুটা মুখোমুখি যুদ্ধ করে শেরম্যানের মূল বাহিনী পাশ ঘুরে জনস্টনের পিছনে গিয়ে হাজির হতে থাকল। বাধ্য হয়ে জনস্টনকে পিছিয়ে আসতে হল। পিছোতে পিছোতে শেষ পাহাড়ি ঘাঁটি আটলান্টার মাইল দশেক দূরে দু'হাজার ফুট উঁচু কেনেস' (Kennesaw) মাউন্টেনে। ক'দিন আগেই দেখে এসেছি কেনেস' মাউন্টেন মেমোরিয়াল পার্ক। উপরে সাজানো উত্তরমুখী ভারী কামান, কনফেডারেট সেনাদের স্মৃতিসৌধ। উত্তর-পশ্চিমে স্টোন মাউন্টেনের আবছা আদল। সেখানে সন্ধ্যারাতে দেখেছি পাহাড়ের গায়ে

চিপাওয়া চকে ওগলথ্রপের সদর্প মূর্তি। রাজা জর্জের নামে এক নতুন উপনিবেশ গড়তে বেরিয়েছিলেন তিনি

খোদাই করা অশ্বারোহী কনফেডারেট রাষ্ট্রপতি ডেভিস, সৈন্যাধ্যক্ষ রবার্ট লি, আর জনস্টনের মূর্তির উপর লেজার রশ্মির জাদুতে গৃহযুদ্ধের ইতিহাস আর অন্ধকার মাঠভর্তি ছেলেমেয়েদের উদ্বেলিত গেয়ে ওঠা 'জর্জিয়া আমার হৃদয়ে'।

কেনেস'-র কামানের আওয়াজ নিশ্চিতভাবেই পৌঁছে যাচ্ছিল উদ্বিগ্ন আটলান্টাবাসীর কানে। আবারও শেরম্যান অনেকটা পথ ঘুরে অনেক উত্তরে চ্যাটাহুচি নদী পেরিয়ে হাজির হলেন আটলান্টার দোরপ্রান্তে। দু'দিন পর জ্বলন্ত আটলান্টাকে পিছনে রেখে উত্তরের বাহিনী এগোল দক্ষিণে সাগরাভিমুখে। শেরম্যান পথ বদলে বদলে চললেন। সমন্বয়হীন বিভ্রান্ত কনফেডারেট সেনানায়কদের মেকনকে ঘিরে সাজানো বাহিনী কোনও লড়াই দিতে পারল না। টেলিগ্রাফের খুঁটি, সাঁকো, পুল, রেলপথ সব উপড়ে ফেলে, খেতের ফসল থেকে টেবিলের চামচটি অবধি লুঠ করে শেরম্যানের বাহিনী এগোল। জমে থাকা লক্ষ লক্ষ বেল তুলোর আগুনে আকাশ লাল, বাতাসে পোড়া ছাই আর বারুদের গন্ধ। চার দিকে আর্তনাদ ইয়াংকিরা আসছে, ইয়াংকিরা

আটলান্টার রিভারফ্রন্ট মার্কেটে

হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত উপড়ে ফেলার জন্য শেরম্যান শুরু করেছিলেন চারশো মাইলের এক বিধ্বংসী অভিযান 'মার্চ টু দি সি'। আমাদের যাত্রা সেই পথে।

শহরের সীমানা ছাড়তেই ইন্টারস্টেট ৭৫ ধরে সোজা দক্ষিণমুখী রাস্তা। পিডমন্ট মালভূমির উপর দিয়ে। জমি ক্রমশ সমতল, রং লাল। দু'পাশের গাছগাছালির ঘনত্ব কম হলে দেখা যাচ্ছে চাষের খেত, রাঙামাটির পথ। স্বাধীনতাকামী প্রথম তেরোটি উপনিবেশের প্রতীক তেরোটি লাল-সাদা ডোরাওলা পতাকা মাথায় একতলা দোতলা বাড়ি। মার্গারেট মিচেলের বর্ণনায় এরই ডানদিকে ক্লেটন কাউন্টিতে ছিল ও'হারাদের খামার 'তারা', অ্যাশলিদের 'টুয়েলভ ওকস'। মনে হয় যেন দেখতে পেলাম মোটা কাঠের বেড়ায় ঘেরা পান্না সবুজ বারমুডা ঘাসে ঢাকা লালচে জমির মাঝে সিডার-ঘেরা পথের শেষে এক প্রসন্ন শোভন আবাস। সাদা দেওয়ালে লতানো রেগুনি উইস্টারিয়া, পাশে ম্যাগনোলিয়ার ঝাড়, সামনে বিছানো অ্যাজেলিয়ার লাল আঁচল। একটু দূরে মাথায় সাদা আঁশ লাগা সবুজ পাতার মধ্যে মিশে গেছে সাদা টুপি আর ঢোলা জামা পরা কালো শরীরগুলো। স্কারলেট ও'হারাদের মতো দক্ষিণি সুন্দরীরা তাদের সতেরো ইঞ্চি কোমরে লম্বা ঘেরের স্কার্ট এঁটে, পুরোহাতা লেস বসানো জামা আর রঙিন বনেট মাথায় কালো ম্যামিদের জিম্মাদারিতে চটুইভাতি আর বলনাচের আসরে যাচ্ছেন। ইংল্যান্ডের বোর্ডিং স্কুল বা ওয়েস্ট পয়েন্ট সামরিক বিদ্যালয়-ফেরত বেপাড়ার ছেলেরাও আছে। ম্যামিরা কড়া নজর রাখছে, মেয়েদের মনের খবরের জন্য ছেলেদের ভরসা নিজস্ব নিগ্রোদাসটি। কী এক অদৃশ্য টরেটক্কায় নিগ্রোমহল সব জেনে যায়।

টমোচিচির সমাধিস্থলে গর্ডন ওয়াশিংটনের লজ্জাকর স্মৃতিসৌধ

সামনে মেকন আসছে। ৮০ মাইল রাস্তা হু-হু করে পেরিয়ে এলাম। আমেরিকান জীবনযাত্রার একটা বড় অঙ্গ ৮/১০ লেনের এই সব সপাটে শ'-শ' মাইল ছুটে চলা রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে গাছগাছালির ফাঁকে হঠাৎ কোনও জড়িবুটি বা লতাপাতা ফুল-বীজের পাড়াগেঁয়ে বিপণি বা পরের ৪০ মাইলের মধ্যে শেষ গ্যাস স্টেশন, এরকম চেতাবনি। আকাশের আবর্জনা বলে গাল দেওয়া দেড়শো-দুশো ফুট উঁচু পঞ্চাশ ফুট চওড়া বিশাল বিলবোর্ডগুলিই একঘেয়ে ছুটে চলা রাস্তায় কিছুটা বৈচিত্র আনে, বহমান স্থানীয় জীবনের সংবাদ দেয়। মিসিসিপির পূর্ব পাড়ে সর্ববৃহৎ নখের চিকিৎসালয় অথবা জর্জিয়ার একমাত্র দেড়শো বছরের পুরনো পারিবারিক পদ চিকিৎসাকেন্দ্রের সগৌরব ঘোষণা বিজ্ঞাপনের চাইতেও বেশি কিছু বলে। রাত্রিতে অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই গতিতে ছুটে চলা শকটের নিদ্রাতুর যাত্রীদের মাঝে-মধ্যে আলোয় উদ্ভাসিত এক-একটা বিলবোর্ড মনে পড়িয়ে দেয় চারপাশের বস্তুজগতের চতুর্মাত্রিক উপস্থিতি। সাভানার রাস্তায় মেকন একমাত্র বড় শহর। মেকন থেকে বাঁদিকে ঘুরলে প্রাক্তন রাজধানী মিলেজভিলের রাস্তা। আরও উত্তর-পূর্বে পুরনো শহর অগাস্টা আর দক্ষিণে চার্লসটন বন্দর। যেখানে এসে থামত ক্রীতদাস আর নতুন অভিযাত্রী-বোঝাই জাহাজ। অঢেল জমি, আবাদ করার লোক নেই, তাই অভিবাসীদের ঢালাও আমন্ত্রণ। সঙ্গে একজন পুরুষ-দাস আনলে ২০ একর জমি বিনামূল্যে, মেয়ে হলে ১০ একর। রেড ইন্ডিয়ানরা স্থানীয় লোক। জোর করে কাজে লাগালে পালায়, নয়তো মারপিট করে। যদিও প্রথম মোলাকাতেই ইউরোপীয়দের আনা অজানা অসুখ বসন্ত, ম্যালেরিয়া আর প্লেগে গ্রামকে গ্রাম উজাড়। দুই মহাদেশের প্রথম আদান-প্রদানে (কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ) রেড ইন্ডিয়ানদের হিসাবের খাতায় অনেক লাল কালির ঢেঁড়া। শস্যশ্যামলা সুবিশাল অকৃপণ এক ধরিত্রী হারিয়ে ওরা পেল মহামারী, বন্দুক, আর ঘোড়া। ওই নতুন জন্তুই বিপদ বাড়াল। শিকারের পিছনে ধাবমান রেড ইন্ডিয়ান নব্য ঘোড়সওয়াররা গতির নেশায় পৌঁছে যেতে লাগল অন্য উপজাতিদের উঠানে। ফলে মারামারি, কাটাকাটি, ক্রমাগত আত্মহনন। একটা ছোট প্রতিশোধ নিয়েছিল তারা ইউরোপিয়ানদের যৌনরোগ সিফিলিস উপহার দিয়ে। বন্দর থেকে রাজগৃহ অবধি সে মারণদূত ইউরোপে বহু মৃত্যুর কারণ।

তামাক, তুলা, নীল রপ্তানি করা দক্ষিণি রাজ্যগুলিতে কটন জিন নামে এক যন্ত্র আবিষ্কারের পরে 'কিং কটন' প্রায় আকাশ থেকে অর্থবৃষ্টি করছে। কিন্তু তাদের বংশানুক্রমিক ক্রীতদাস ব্যবস্থা উত্তরের নিউ ইংল্যান্ডের পিউরিটান পিলগ্রিমদের বংশধর ইয়াংকিদের সয় না। উত্তর দক্ষিণে বিরোধ লাগল। অবশ্য উত্তরের সবাই নিগ্রোপ্রেমী আর দক্ষিণের খামার মালিকরা সবাই নিগ্রোদ্বেষী, এমনটা নয়। কারণটা অর্থনৈতিক। ওয়াশিংটন তো বটেই, সংবিধান রচয়িতা জেফারসনেরও প্রচুর ক্রীতদাস ছিল। সেই জেফারসনের বিপত্নীক জীবনের সঙ্গিনী ক্রীতদাসী স্যালি হেমিংসের সন্তানরা জেফারসনের জীবদ্দশায় আইনের চোখে ক্রীতদাসই ছিল। নতুন গড়ে ওঠা মিশ্র সমাজে সাদা কালোর সম্পর্কটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা হিসপানিওয়ালার মতো মালিক দাসের একমাত্রিক সম্পর্ক ছিল না। দূরে দূরে একটেরে বাড়িগুলোতে খেলার সাথী সাদা-কালো ছেলেদের মধ্যে একটা মানবিক সম্পর্কও হত। 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-এ সে গল্প আছে। আবার টমের নতুন মালিক সেন্ট ক্লেয়ার ক্রীতদাস রাখে কিন্তু নিগ্রো-গুণগ্রাহী, তার বোন ওফেলিয়া দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, কিন্তু নিগ্রোনিন্দুক। কালো মানুষের বন্ধু লিংকনের আদেশ সত্ত্বেও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান সেনাপতি শেরম্যানের নিজের বাহিনীতে কালোরা ব্রাত্য ছিল। তাঁর কথায়, স্টিল এবং লোহার মতোই সাদা এবং কালো আলাদা। ওদিকে দাসপ্রথার পক্ষে যুদ্ধরত দক্ষিণি রাজ্যগুলির সর্বাধিনায়ক রবার্ট লি নিজে দাসপ্রথার বিরোধী ছিলেন।

মেকন থেকে আই-৭৫ ছেড়ে এবার পূর্বমুখী আই-১৬। সামনে পিছনে ক্যারাভান বা নৌকা-বাঁধা গাড়ির স্রোত, রাস্তা সত্যিই চলেছে সমুদ্রের দিকে। সাভানা আর ঘণ্টা আড়াই, তবে পান্থশালা দশটার আগে ঘর দেবে না। বিকেল পাঁচটার চড়া রোদ সে-চিন্তাকে আমল দিচ্ছে না। একটা এক্সিট নেওয়া যেতে পারে। নিলেই জানি ঠিক পৌঁছে যাব কোনও চিক-ফিল-এ বা ওয়াফেল হাউসে। নিদেন পক্ষে ম্যাকডোনাল্ড বা বার্গার কিং, আজকাল চা-কফিও পাওয়া যায়। পাশের চত্বরে থাকবে বিভাগীয় বিপণি। চিরুনি থেকে মাছ ধরার ছিপ, কোনওটা ভুলে এলেও অসুবিধা নেই। গোটা দেশটাই একই ছাঁদে, ধাঁধা লাগার সম্ভাবনা নেই। মেকন থেকে সাভানা যাওয়ার পথে ডাবলিন ছাড়া বড় শহর নেই। দু'ধারে ক্রমশই বিস্তৃততর চাষের খেত, জমি কালচে লাল, গাছগুলোও তেমন ঘনবদ্ধ নয়,

আসছে। কভিংটনের স্বামীহারা মিসেস বারোজ দিনলিপি লিখছেন, '১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৪ সব লুঠ। স্মোক হাউসে রাখা হাজার পাউন্ড মাংস সুদ্ধ। শুয়োরগুলোকে গুলি করে আমাদের আদরের ঘোড়াটাকেও নিয়ে গেল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৬৪ সকালে উঠেই সাদাই (কন্যা) ওর মোজাটায় কিছু নেই দেখে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ল আবার। নিগ্রো বাচ্চাগুলো এসে লাফাতে লাগল, মিসাস আমাদের উপহার! মিসাস আমাদের উপহার! আমিও সাদাইয়ের পাশে শুয়ে পড়লাম, মা মেয়ের চোখের জল মিশে গেল'। লিংকনের হাতে তখন শেরম্যানের তার, 'প্রিয় প্রেসিডেন্ট, ক্রিস্টমাসে আপনাকে আমার বিনীত উপহার, সাভানা নগর, দেড়শোটি কামান, আর পঁচিশ হাজার বেল তুলো'।

এতক্ষণে অন্ধকার পৃথিবীর মধ্যে ক্রমশ জেগে ওঠা নানা দীপ্যমান হাতছানি দেখে মনটা বর্তমানে ফিরল। আই ১৬ এবার আই ৯৫ আড়াআড়ি পেরিয়ে গেল। সাভানার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তদেশে ঢুকে পড়েছি। চক্রাকারে গাড়ি ঘুরছে ভূস্থানিক উপগ্রহের নির্দেশ অনুসরণ করে, রাস্তা থেকেই দূরভাষে নৈশ আহারের ঠাঁই পেতেছি এক রেস্তোরাঁয়। ভোজ্যতালিকাটি বেশ লম্বা চওড়া, তবে বিফ আর চিকেনেরই প্রাধান্য। ভিনদেশি মুরগি আর দেশজ টারকির লড়াইয়ে, দেশজ প্রাণীটি বোধহয় ক্রমশ পশ্চাৎগামী। পান্থনিবাসে পৌঁছলাম রাত এগারোটায়, তখনও দেখি জনা ছ'সাত বালক প্রবল উদ্যমে জলকেলি করছে। বাবা মায়েরা সম্ভবত রোঁদে, সেই সুযোগে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা উৎসব।

সকালের মিঠে রোদে হাজির হলাম সাভানার ঐতিহাসিক অঞ্চলে। গাড়ি ছেড়ে পদব্রজে ভ্রমণ। শিশিরভেজা শৈবাল আচ্ছাদিত গাছের নরম ছায়ায় ঢাকা মূর্তি-সৌধে সাজানো এক-একটি উদ্যান চত্বর ঘিরে নানা ছাঁদের পুরনো ইউরোপীয় কায়দায় বাড়ি। গাছগুলির মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে চার্চের গথিক ছাঁদের সূচালো শিখর। সাভানার দূরদর্শী পৌরপিতারা ১৮৬৪-র ২২ ডিসেম্বর শেরম্যানের হাতে নগরকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন, ফলে রোম, মারিয়েট্টা, আটলান্টা, মিলেজভিলের হাল হয়নি সাভানার। আগের রাতেই শহর ছেড়ে সরে গেছে কনফেডারেট বাহিনী। প্যারিসের মতো দু'-দু'বার শত্রুবাহিনী অধিকৃত হয়েও ইংরেজ লর্ড ওগলথ্রপের তৈরি সাভানা অক্ষত থেকেছে নিজ মাধুর্যে।

ওগলথ্রপের পরিকল্পনা ছিল ইংল্যান্ডের কারাগারগুলিতে মামুলি দেনার দায়ে বা ভাগ্যের ফেরে বন্দি লোকেদের নিয়ে আমেরিকায় আর একটা নতুন উপনিবেশ স্থাপনের, ত্রয়োদশ উপনিবেশ হিসাবে যা হবে রাজা জর্জের

রুমাল উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্লোরেন্স

নামে জর্জিয়া, স্প্যানিশ ফ্লোরিডা আর সাউথ ক্যারোলিনার মধ্যে এক প্রতিরক্ষী সীমান্ত রাজ্য। দেড়শো জন অভিযাত্রী নিয়ে ওগলথ্রপের ঘোড়া ছুটল দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ধরে ভবিষ্যৎ রাজ্যের উপযুক্ত জন্মস্থলের খোঁজে। পছন্দ হল সাভানা নদীর পাড়ে কিন্তু নদী থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু এক ডাঙা জমি, মোহনা থেকে মাইল চোদ্দো ভিতরে, নদী-বন্দরের উপযুক্ত। ইয়ামাক্রো উপজাতিদের নেতা টমোচিচির সাদর আতিথেয়তায় ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৩৩ অভিযাত্রীরা প্রথম ঠাঁই পাতলেন সাভানায়। অনুষ্ঠিত হল প্রথম কৃতজ্ঞতা ভোজ, যার স্মরণে আমেরিকান থ্যাংকস গিভিং ডে। যদিও নিউ ইংল্যান্ডে প্রথম কৃতজ্ঞতা ভোজ দেওয়া অভিযাত্রীদের হাত অচিরেই আশ্রয়দাতা ওয়ামপনগদের রক্ত মাখবে, তবু টমোচিচি আর ওগলথ্রপের বন্ধুত্ব স্থায়ী ছিল আজীবন।

স্টিভেনসনের গল্প অনুযায়ী, ফ্লিন্ট জীবনের শেষ চার বছর কাটান সাভানার সরাইখানা 'পাইরেটস হাউস'-এ। তা এখন এক মস্ত রেস্তোরাঁ, দক্ষিণি খাবারের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান সি'র জলদস্যুদের গল্প বলে।

যার অনুসরণেই হয়তো বিখ্যাত দক্ষিণি আতিথেয়তার জন্ম। পরকে ঘর দিতে যা এককথায় রাজি।

জায়গা ঠিক না থাকলেও ওগলথ্রপের পকেটে তৈরি ছিল দাবার ছকের মতো সমান্তরাল আর আড়াআড়ি রাস্তার জাফরিঘেরা চৌকোনা চকে বিভক্ত এক নগরের। প্রতিটি চকের মাঝে থাকবে বাগান বা খোলা চত্বর, তার পূর্ব আর পশ্চিম দিকে সরকারি বাড়ি, বাণিজ্যকেন্দ্র, চার্চ, বিদ্যালয়, উত্তর আর দক্ষিণে নাগরিকদের আবাস। নগরের বাইরে পরিবার-প্রতি ৪৫ একর কৃষিজমি, পশুখামার। সব মিলিয়ে তৈরি চব্বিশটি চকের মধ্যে তিনটি বাণিজ্যিক স্বার্থের বলি হয়েছে। বাকি একুশটি তেমনই আছে। কৃতিত্ব কিছু স্থানীয় নাগরিক সংগঠনের অনমনীয় লড়াইয়ের, চাঁদা তুলে যাঁরা পুরনো নির্মাণ নিরন্তর সংস্কার করে চলেছেন। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পরে তৈরি হল ফরসাইথ উদ্যান। আর উত্তরে নদীর ধার বরাবর রিভার স্ট্রিট জমে উঠল ক্রমশ গড়ে ওঠা বন্দরের টানে আসা তুলা ব্যবসায়ীদের নিলামি হাঁকডাকে, আর পানশালা সরাইখানায় জাহাজিদের আড্ডায়। ততদিনে অবশ্য কঠোর নীতিবাগীশ ওগলথ্রপ সাভানা থেকে বিতাড়িত। দাস ব্যবসা ও মদ্যপান বেআইনি করে রাখা, আর রাজাজ্ঞা অমান্য করে নানা ধর্মীয় উদ্বাস্তু এমনকী ক্যাথলিক আর ইহুদিদের আশ্রয় দেওয়ার দাম দিতে হয়েছিল তাঁকে।

জনস্টন চকের পূর্বে, গ্রিক মন্দিরের আদলে ডোরিক কলামের উপর ত্রিকোণ ললাট নিয়ে শ্বেতশুভ্র 'ক্রাইস্ট চার্চ' জর্জিয়ার প্রথম উপাসনা গৃহ। দেখলাম সামনে ভিড় করছে রবিবারের সুবেশ জনতা। ভিড়ে পড়লাম তাদের দলে। সুরেলা অর্গানের সঙ্গে কিশোরী-কণ্ঠে প্রার্থনাসংগীত, যাজকের উপদেশবাণী পাঠ, আর সমবেত প্রার্থনার পর সবাই সারি বাঁধলেন কমিউনিয়ন নেবার জন্য। একজন জানালেন, ওঁদের ওপেন কমিউনিয়ন অর্থাৎ চার্চের সভ্য না হলেও কমিউনিয়ন পেতে পারি। কিন্তু আমরা তো খ্রিস্টানই নই, তবে সবই খাই আর ইউক্রাইস্ট তো পবিত্র জিনিস। বেদির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম। চামর দুলিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ল্যাটিন মন্ত্র পড়ে যাজকমশাই মুখে দিলেন রুটির টুকরো আর ঠোঁটে ওয়াইনের গ্লাস। আলাপ হল কয়েকজনের সঙ্গে। সে দিনের উপদেশক রেভারেন্ড মেলি মিশুকে মানুষ। ব্যবহারিক জীবনে নামকরা পাচক মেলি আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই যাজক। এক ভদ্রমহিলা উদ্যোগী হয়ে আলাপ করালেন আরও ক'জনের সঙ্গে, নিমন্ত্রণ এল সেদিনকার বিশেষ মধ্যাহ্নভোজে তো বটেই, এমনকী সান্ধ্য আহারেও। ভদ্রমহিলার উৎসাহ দেখে মনে হল

আমরা রাজি হলেই আরও পাঁচ-সাতজনকে ডেকে বাড়িতে ভোজ লাগাবেন। এমনই নাকি সাভানার লোকেদের স্বভাব।

চার্চ থেকে বেরিয়ে এক-একটা চক পেরিয়ে চললাম। চিপাওয়া চকে ওগলথ্রপের সদর্প মূর্তি। তবে কী এক বিষম বুদ্ধিতে রাইট চকে টমোচিচির সমাধিস্থল উৎখাত করে রেল কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছেন তাঁদের প্রথম অধ্যক্ষ গর্ডন ওয়াশিংটনের স্মৃতিসৌধ। লজ্জায় ওয়াশিংটনের বাড়ির লোকেরাই তৈরি করেছেন টমোচিচির আর-একটি স্মারক। এক দীর্ঘদেহী কনফেডারেট স্মারক স্তম্ভকে কেন্দ্র করে, মধ্যবৃত্ত থেকে ছড়িয়ে পড়া ফরসাইথ উদ্যানে প্যারিসের প্লেস ডি লা কনকরডের ফোয়ারার অনুকরণে তৈরি ফোয়ারাটি বেশ বিখ্যাত। কিছু ইতিহাস-জড়িত বাড়ির সামনে আলাদা ভিড়, বেশি উৎসাহ গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়েট লো-র বাড়ি ঘিরে। চত্বরগুলির বাইরের বড় রাস্তা দিয়ে সরকারি বাসে— তাতে কোনও ভাড়া লাগে না— দেখে নেওয়া যায় পুরানো ক্যাপিটল, মিউজিয়াম, সাভানা আর্ট কলেজ। ডেভেনপোর্ট বা মারশার উইলিয়াম ভবনের পারিবারিক সংগ্রহশালায় সাজানো গৃহসজ্জা বা তৈজসপত্রের আয়োজন এক সময়ে ইংরেজ লর্ডদের ঈর্ষার বিষয় ছিল। নানা পরিচালিত ভ্রমণের বাসও ঘুরছে, ঘোড়ার টানা গাড়িও। কারও আখ্যানবস্তু ইতিহাস, কারও খাবারদাবার, কারও স্থানীয় সংস্কৃতি। সাভানার হানাবাড়ি ভ্রমণ বিখ্যাত। পশ্চিমি সব পুরনো শহরেই দেখেছি ঈশ্বরের দূতেদের পাশাপাশি অশরীর আত্মাদের সঙ্গে মোলাকাতেরও একটা ব্যবস্থা থাকেই। প্রেতাত্মার উপস্থিতি তো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতোই সে শহরের পুরনো গল্পকথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবিশ্বাসী হ্যামলেটদের প্রতীতি প্রণয়নের অব্যর্থ পন্থা। সাভানার বিখ্যাত প্রেতাত্মা হলেন ট্রেজার আইল্যান্ডের গুপ্তধনের মালিক ক্যাপটেন ফ্লিন্ট। স্টিভেনসনের গল্প অনুযায়ী, ফ্লিন্ট জীবনের শেষ চার বছর কাটান সাভানার সরাইখানা 'পাইরেটস হাউস'-এ। তা এখন এক মস্ত রেস্তোরাঁ, দক্ষিণি খাবারের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান সি'র জলদস্যুদের গল্প বলে। ওখানে গেলে পানীয়ের মাত্রা সম্বন্ধে সাবধান। হুঁশ হারালে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে বেমালুম চালান হয়ে যেতে পারেন কোনও দস্যুজাহাজে। বন্দি খালাসি হিসাবে। এরকম নাকি সে আমলে প্রায়ই ঘটত।

চলে এলাম বে স্ট্রিট। নদী থেকে খাড়াই চল্লিশ ফুট উঁচু সাভানার ডাঙাজমির উত্তর সীমা। এর পরই নদীর ধার বরাবর রাস্তা রিভার স্ট্রিট ঠিক তিনতলা নীচে। ওঠা-নামার ব্যবস্থা ঘোরানো রাস্তায় অথবা লিফটে। ট্রলি কার যাওয়ার লাইন পাতা রিভার স্ট্রিট প্রায় সেকেলে স্ট্যান্ড রোড। শহরের দিকটায় পুরনো তুলা ব্যবসার জন্য তৈরি কেজো তিনতলা-চারতলা বাড়ি। একতলায় এখন দোকানপাট, পুরনো ধরনের ট্যাভার্ন। আধো অন্ধকার কিঞ্চিৎ স্যাঁতস্যাঁতে বড় বড় ঘরে তক্তা-পাতা মেঝে। কাঠের ভারী আসবাব আর আংটা থেকে ঝোলানো বিয়ারের বড় বড় মাগে একটা জাহাজি জাহাজি ভাব। জলের ধারটায় কিছুটা খোলা চত্বর। সামনে রাজহংসীর মতো গা এলিয়ে ভাসমান ধপধপে প্রমোদ-তরণী। বাঁদিকে মধ্যাকাশে ঝুলন্ত দু'মাইল দীর্ঘ ট্যালমেজ ব্রিজের উপর সওয়ার হয়ে ইউ-এস-১৭ যাচ্ছে দক্ষিণ ক্যারোলিনার দিকে। ডানদিকে মোটা কাঠের বিমে আঁটা ছাউনির তলায় এক হাটুরে বাজার। অল্পবয়সি দু'টি মেয়ে দু'পাশে বিনুনি ঝুলিয়ে খরিদারিতে ব্যস্ত। চেহারার আদলে টমোচিচির সঙ্গে আত্মীয়তার আভাস। পসরা অবশ্য সেই পুঁতির মালা, চুলের ফিতে, নকশাকাটা মোটা বালা। পাশেই ডলফিন পয়েন্ট থেকে নৌকা যাবে ডলফিন দেখাতে, তবে বিকালের আগে নয়। আরও পূর্বে মরকেল পার্ক। যেখানে বাতাসে রুমাল উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্লোরেন্স, প্রায় অর্ধ শতাব্দি ধরে সাভানা-আগত প্রতিটি জাহাজকে রুমাল উড়িয়ে বা লণ্ঠন দুলিয়ে স্বাগত জানাতেন। হয়তো সেই আশায় যে, ওই জাহাজেই ফিরবে তার নিরুদ্দিষ্ট প্রেমিক। বিশ্বের তাবৎ জাহাজিদের প্রিয় সেই ভঙ্গিকে ব্রোঞ্জের আধারে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন এক বিখ্যাত স্থপতি।

নদীর ওপারে ছোট ছোট দ্বীপ, তাতে বাতিঘর, পুরনো দুর্গ, সেনাছাউনি। গাড়িতে যাওয়া যায় একেবারে সাগরকূলে টাইবি দ্বীপে। বিস্তৃত বেলাভূমির উপর পুরনো দুর্গ আর বাতিঘর। গিয়ে দেখি দুপুররোদে জলে ভিজতে আর বালিভাজা হতে হাজির বহু লোক। তিনশো বছরের পুরনো বাতিঘর এখনও চালু, তবে মাথায় উঠতে বাধা নেই। উল্টোদিকের কামান সাজিয়ে ফোর্ট স্ক্রিভেন। তবে পুরোটাই দেখনদারি, দুর্গ এখন কিছুটা জাদুঘর, কিছুটা নিবাস। বেলা পড়তে সাভানা নদীর বিস্তৃত জলে ডলফিনের দেখা পেতে ঘুরতে হল অনেকটাই। ওরকমটাই বোধহয় ওদের দস্তুর। ডলফিনের ঝাঁক দেখে মাঝি ছোকরাদু'টি জলে কিছু খাবার ফেলতেই ওরা খুশ। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নানা খেলা দেখাতে শুরু করল। যান্ত্রিক নৌকা এবার এগোল তীব্র বেগে। পিছনে দু'পাশে বিচ্ছুরিত ফোয়ারার মতো জলস্রোত। তার উপর দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে দু'পাশে দু'টি ডলফিন সঙ্গ ধরল। গতি যত বাড়ে, তত বাড়ে ওদের স্ফূর্তির বহর। নদীর বিস্তার ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। নৌকার গতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে কূলরেখার দিকচক্রবাল। একদিকে অপসৃয়মান নগরের তীর, নোঙর-ফেলা জলযান, পুরনো নির্মাণের লৌহকাঠামো, নাগরিক আবাস, অন্যদিকে স্পষ্টতর ঘন ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপের অভ্যন্তর। পুরনো দুর্গের প্রাকার, পরিত্যক্ত বাতিঘর। নির্জন নদীতে চারপাশে শুধু শুশুকের দল। পশ্চিমা সূর্যের কৌণিক রশ্মি তাদের কালো শরীরের উপর জলের ফোঁটায় অসংখ্য আলোকবিন্দু তৈরি করছে।

মাঝি ছেলে দু'টির গায়ের রং আর মনে নেই। গৃহযুদ্ধের পরেই পুনর্মিলন আর পুনর্গঠনের যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার সাফল্যের প্রমাণ, ওঁদের মতে, কনফেডারেট আর ফেডারাল সৈন্যদের স্মৃতিতে এক অভিন্ন মেমোরিয়াল ডে-র উদযাপন, আর মার্টিন লুথারদের সাদর স্বীকৃতি।

টাইবি দ্বীপের বেলাভূমিতে